

নিজেদের পৃথিবী নিজেদের মনের মত করে  
গড়ে তোলার জন্য তরুণদের প্রস্তুত করে দিতে হবে

মুহাম্মদ ইউনুস

ফেব্রুয়ারি ২৬, ২০০৭ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে  
সম্মানসূচক "Doctor of Laws" ডিগ্রী গ্রহণ উপলক্ষে প্রদত্ত বক্তৃতা

নিজেদের পৃথিবী নিজেদের মনের মত করে  
গড়ে তোলার জন্য তরুণদের প্রস্তুত করে দিতে হবে

মুহাম্মদ ইউনুস

২০৫০ সালে পৃথিবীর মানুষের জীবনযাত্রা কেমনভাবে চলবে? ২০৩০ সালে কেমন হবে মানুষের দৈনন্দিন জীবন? পৃথিবী নামের যে গ্রহে আমরা বাস করি তার কী হবে? মানুষের রাজনৈতিক জীবনে, সামাজিক জীবনে অর্থনৈতিক জীবনে কী পরিবর্তন আসবে? কী হবে, সেটা একটি প্রশ্ন। কী হলে ভালো হবে সেটা অন্য একটি প্রশ্ন। কী হলে ভাল হবে সেটা যদি আমাদের কাছে পরিষ্কার থাকতো তাহলে আমরা সেরকমটি করার উদ্যোগ নিতে পারতাম। 'কী হবে' এটা একরকমের প্রশ্ন। অন্য রকমের প্রশ্ন হলো 'কী হলে ভালো হয়'। দু'টি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রশ্ন। একটাতে আমি নিজের জন্য কোন ভূমিকা রাখি না। অন্যটাতে আমি আমার স্বপ্ন দিয়ে গড়তে চাই ভবিষ্যতকে। আমাদের মন স্থির করতে হবে আমাদের হাতে আলাদীনের চেরাগ থাকলে সৈন্তের কাছে কী চাইতাম? কী রকম পৃথিবী চাইতাম? কী রকম বাংলাদেশ চাইতাম? তারপর মনে করতে হবে আমরাই ত আলাদীনের সে কর্মবীর সৈন্ত। আমাদেরকেই আমাদের মনের মত পৃথিবী বানাতে হবে। আমাদের মনের মত বাংলাদেশ বানাতে হবে। আমরা চাইলে পারি। আমাদের চাইতে হবে। ঘটনা ঘটতে হবে। তাহলেই ত ঘটনা ঘটবে।

এপর্বন্ত আমাদের এইটি যত বসবাসযোগ্য ছিল, ততটি বসবাসযোগ্য আর থাকতে পারছে না। আমরাই একে দ্রুত বসবাসের অযোগ্য করে ফেলছি। এই নৈতিবাচক পরিবর্তনের গতিটা ক্রমশঃ দ্রুততর হচ্ছে। আমরা দ্রুত সংকেটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। অথচ পৃথিবীর মানুষ জেনেও না-জানার ভান করে যাচ্ছে। বিশেষ করে যেসব দেশের মানুষ এই সংকেট সৃষ্টির প্রধান উপাদান যোগাচ্ছে তারা নিজেদের জীবন উপভোগ করার মধ্যে এত মেতে আছে সংকেট ঠেকানোর ফলপ্রসূ কোন উদ্যোগ

দানা বাঁধছে না। আমরা যেহেতু এ সংকটের প্রথম শিকার হবো আমাদেরকেই সোচ্চার হতে হবে বেশি। তবে দ্রুততর গতি আমাদের জন্য ইতিবাচক অনেক সম্ভাবনাও সৃষ্টি করেছে, যদি সেটি আমরা গ্রহণ করতে জানি। প্রযুক্তির ক্ষেত্রে যা কিছু ঘটছে তাকে আমাদের স্বপক্ষে আনার সুযোগ রয়েছে।

প্রযুক্তির সকল শাখায় দ্রুত উন্নয়ন হচ্ছে। কিন্তু প্রযুক্তির দুটি শাখায় যে পরিবর্তন আসছে এবং যে গতিতে আসছে তা মানুষকে ক্রমাগতভাবে পাল্টে দিচ্ছে। মানুষের চিন্তার ধরণ পাল্টে দিচ্ছে, পারস্পরিক সম্পর্কের ধরণ পাল্টে দিচ্ছে, যোগাযোগের ধারণা পাল্টে দিচ্ছে, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের রীতিনীতি পাল্টে দিচ্ছে। দু'দিন আগে পর্যন্ত মানুষ যাকে অসম্ভব কাত মনে করেছে, দু'দিন পর সেটা নিতানৈমিত্তিক স্বাভাবিক কাজে পরিণত করে দিচ্ছে। এই দু'টি প্রযুক্তি হলো তথ্য প্রযুক্তি এবং জৈব প্রযুক্তি।

গত পঁচিশ বছরে এই দুই প্রযুক্তির কারণে মানুষের জীবনে যে পরিবর্তন এসেছে ঠিক একই গতিতে যদি এই দুই প্রযুক্তিতে উন্নয়ন অব্যাহত থাকে তবে আগামী পঁচিশ বছরে মানুষের জীবনে কী কী পরিবর্তন আসবে? অবিশ্বাস্য পরিবর্তন আসবে তাতে সন্দেহ নাই। গত পঁচিশ বছরে এই দুই প্রযুক্তিতে যে পরিবর্তন এসেছে সে পরিমাণ পরিবর্তন আসতে আবার পঁচিশ বছর যে লাগবে না সেটা সবার জানা। হয়তো দশ বছরে বা তারো কম সময়ে সে পরিবর্তন আসবে। অর্থাৎ পঁচিশ বছরের পরিবর্তন একটা প্রকাজ পরিবর্তন হবে। সে চিন্তা মাথায় রেখে ২০৩০ সালের বাংলাদেশের বাস্তবতার পটভূমিতে একটি উপন্যাস রচনা করলে সেটি কি খুবই অলীক মনে হবেনা? অথচ সেদিনের বাস্তবতা অবশ্যম্ভাবীভাবে এরকম কিছুই হবে। আজ যারা আঠারো বছর বয়সী, ২০৩০ সালে তাদের বয়স হবে একচল্লিশ বছর, তারা থাকবে তাদের যার যার পেশার সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ এবং উচ্চি অবস্থানে। আমরা এখন যে জানাটি তাদের হাতে তুলে দিচ্ছি সেটা সেদিন তার কতখানি কাজে লাগবে? তাকে কি জানের মৌলিক কাঠামোটির পুনর্বিন্যাস করার কাজটিও শিখিয়ে দিচ্ছি? যাতে করে সে কিছুদিন অন্তর অন্তর অংশবিশেষ বদলিয়ে আবার নতুন করে একে বেঁধে নিতে পারে? তার জ্ঞান কি আপডেটেড থাকে? নাকি পুরনো ধারণায় পুরনো দৃষ্টিভঙ্গীতে আবদ্ধ হয়ে থাকে?

প্রতিনিয়ত জ্ঞানকে সময়োপযোগী এবং বাস্তবোপযোগী করার মানসিকতা এবং কলাকৌশল শিখিয়ে দেয়াকে আমি শিক্ষার অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশ মনে করি। জন্মের মুহূর্তে আমরা সম্পূর্ণ খোলা মন, খোলা চোখ, খোলা কান নিয়ে সবাই জন্মগ্রহণ করি। ঐ মুহূর্ত থেকে আমাদের চোখ কান মাথা পৃথিবী থেকে সকল তথ্য আহরণ করে জমা করে, বিশ্লেষণ করে যেতে থাকে। সবচেয়ে বড় কথা তার তথ্য আহরণ করার এবং বিশ্লেষণ করার ভঙ্গীটি গড়ে উঠে। তার আসন্ন পরিবেশ তাকে একাজে শিক্ষকতা করে। শিক্ষায়তনে আসার পর শিক্ষকরা পরবর্তীতে এদায়িত্ব পালন করেন। আমার অভিযোগ প্রায় ক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষার্থীকে তার স্বকীয়তা নিয়ে চিন্তা করতে সহায়তা না-করে তাঁর কাজ সহজ করার জন্য, অথবা তাঁর নিজের দৃষ্টিভঙ্গী এবং বিশ্লেষণভঙ্গীর যথার্থতায় বেশি বিশ্বাসী বলে শিক্ষার্থীকে সম্পূর্ণ নিজের ভঙ্গীতে অথবা বইয়ের ভঙ্গীতে গড়ে তোলেন। শিক্ষার্থীর স্বকীয়তা সংরক্ষণ বনাম শিক্ষকের ও প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বের গ্রহণাবের মাত্রা বিতর্কে আমি বরাবর শিক্ষার্থীর স্বকীয়তা সংরক্ষণের পক্ষে থাকি। আমি মনে করি তাতেই জ্ঞানের নতুন জগত সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা বাড়ে। স্বকীয়তা সংরক্ষণ সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে যদি শিক্ষকের চিন্তার আদলে শিক্ষার্থী তৈরি হয় তাহলে জ্ঞানের প্রবৃদ্ধি শূন্য হয়ে যাবে। জ্ঞানের সমৃদ্ধির সবচেয়ে বড় যে শর্ত, নিতানতুন গ্রহণ-বর্জন, সেটা ধমকে যাবে।

আমার বক্তব্যগুলি সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। আর তেমনি প্রযোজ্য ফলিত প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও যেখানে সমাজ বিজ্ঞানের সঙ্গে তার একটি মিথস্ক্রিয়া থাকে। আমাদের শিক্ষায়তনসমূহের শিক্ষক অনেক ক্ষেত্রে নিজের দৃষ্টিভঙ্গী বা নিজের বিশ্লেষণও দেন না, তিনি পাঠ্যবইয়ের কোন পর্বেতির বরাতে দিয়ে তাঁর বক্তব্য রাখেন। ফলে শিক্ষার্থীর মনে আরেকটি ধারণা বদ্ধমূল হয়: তা হলো এগুলি এতো জটিল বিষয় যে আমাদের এখানে কখনো একা ভ্রমণের কোন উপায় নেই। বিষয়ের ভেতর ঢুকতে হলে পাঠ্যবইয়ের কোন মহাপণ্ডিতের আলো অনুসরণ করে ঢুকতে হবে। তিনি যতটুকু দেখেন ততটুকুই দেখার, তিনি যেটুকু দেখতে চেয়েছেন সেটুকুই দেখার যোগ্য। ফলে শিক্ষার্থী নিজের চোখের উপর আঁধা হারিয়ে ফেলে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নকল চোখ নিয়ে বের হয়ে আসছে। নিজের বাড়ী ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা সমস্যা, যেটা ছিল অত্যন্ত একটা সাদামাটা সমস্যা, তাই এখন নকল চোখ দিয়ে দেখে একটা জটিল সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়ে দেয়। যে



সমস্যা একটা টোকা দিলে পড়ে যেতো, সেটার জন্য এখন কামান-বন্দুকের বোজাবুজি পড়ে যাচ্ছে।

গ্রামীণ ব্যাংকের জন্য এমনি একটা টোকা দেয়ার উদ্যোগ থেকে। বিয়াল্লিশ জন মানুষ মহাজনের কাছে প্রায় দাসত্ব বরণ করেছিল মাত্র ৮৫৬ টাকা ঋণের দায়ে। আমি ভাবলাম সমস্যা কঠিন, তবে সমাধান ত খুব সোজা। আমি ৮৫৬ টাকা আমার পকেট থেকে দিয়ে দিলেই ত সমস্যার তাত্ক্ষণিক সমাধান হয়ে যায়। সেভাবেই সমাধান করলাম। কিন্তু তাদের ভীষণ কৃতজ্ঞতাবোধ থেকে আমার মনে নতুন প্রশ্নের উদয় হয়েছিল। এঁদেরকে ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা করে দিলে কেমন হয়? ব্যাংকের কাছে যখন প্রস্তাব দিলাম তারা রাজী হলো না। বল গরীবরা ঋণ পাবার উপযুক্ত নয়। কারণ তারা জামানত দিতে পারে না। জামানত ছাড়া ব্যাংকিং হয় না। আমি প্রশ্ন তুলেছিলাম কেন হবে না। হোয়াই নট?

শিক্ষার একটা বড় কাজ হলো শিক্ষার্থীর মনে এই প্রশ্ন বড় করে গেঁথে দেয়া: হোয়াই নট? কেন হবে না? এবং তাকে উদ্বুদ্ধ করা সনাতনভাবে যা হয়ে আসছে, চলে আসছে তাকে পাশ্চাত্য দেবার উদ্যোগ নিতে। আমার ধারণা আমরা প্রতিষ্ঠিত বিষয়ের প্রতি অনুগত শিক্ষার্থী ভুলবাসি। কেউ ডেউ উঠাতে চাইলে প্রায় সমস্ত শিক্ষক বিরক্ত হন। শুধু বাংলাদেশে নয় সারা দুনিয়ার শিক্ষা জগতে এই প্রবণতাটি রয়েছে।

শিক্ষার্থীকে বাস্তবের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ দেয়া হয় না। সমাজকে অনুভব করার আত্মস্থ করার কোন সুযোগ তার নেই। ক্লাশে তার ফ্রেড নিয়ে মা-বাবা-শিক্ষক সবাই অত্যন্ত ব্যস্ত। এই ব্যস্ততার মধ্যে কাগজের পৃষ্ঠায় কঠিন শব্দে অস্পষ্ট ভাষায় চোখা চোখা কিছু বাক্য দিয়ে তাকে সমাজ সম্বন্ধে ধারণা দেয়া হয়। সারা জীবন সে ওটাই সমাজ এবং মানুষ বলে জেনে আসে। বইয়ের পাতা থেকে বের হয়ে পথের শিশুটি সম্বন্ধে তার জানা হয় না, যে রিক্সাতে করে খুলে যায় রিক্সাওয়ালার সঙ্গে তার পরিচয় হয় না, বাড়ীতে যে বুয়াকে রোজ হুমকী ধামকী দিচ্ছে তিনি কোথায় থাকেন, তাঁর কয় ছেলেমেয়ে, তারা কী করে, স্বামী খোঁজ খবর নেয় কিনা, তার সম্বন্ধে তার কোন আগ্রহ জন্মায় না।

যদি 'হোয়াই নটের' বীজটি শিক্ষার্থীর মাথায় ঢোকানো যেতো তবে তার চোখে এমন সব জিনিস ধরা পড়তো যেটার অস্তিত্বই এখন তার চোখে ধরা পড়ে না। 'হোয়াই নট' জড়িত চোখ শুধু স্পষ্ট দেখবেই না,

সমাধানও খুঁজে পাবে। সমস্যা ও সমাধান পাশাপাশি বাড়ীর বাসিন্দা। সমস্যাকে অতি কাছের থেকে দেখতে পারলে অনুভব করতে পারলে দেখা যাবে দূর থেকে তাকে যত ভয়ঙ্কর মনে হচ্ছিল এটা তত ভয়ঙ্কর মোটেই নয়। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে দূর থেকে জটিল চোখে দেখি বলে সমস্যাকে জটিল মনে হয়। শিক্ষার্থীকে একজন মানুষের একদিনের সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে উৎসাহিত করলেও অনেক জ্ঞান লাভ হবে— সে যে বিষয়ের শিক্ষার্থীই হোক।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাকে শক্ত ভাবে জীবন-বাস্তবতার উপর দাঁড়িয়ে কর্ম-যজ্ঞের সঙ্গে তার নিবিড় সম্পর্কে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে। দেশে যে সব উদ্যোগ ও প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে, দেশের মানুষের সুখ-দুঃখ আর ভবিষ্যৎ যে সব কাজের সঙ্গে জড়িয়ে, তাতে নিজ নিজ ক্ষেত্র থেকে কিছুটা হলেও নিজেকে জড়িত না করে একজন বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র প্রয়োজনীয় পরিপক্বতা বা আত্মনিয়োগ গড়ে তুলতে পারেনা। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরের কর্মযজ্ঞের সঙ্গে শিক্ষার ব্যবধানটি প্রকট ভাবে ধরা পড়ে যখন গ্রাজুয়েট হয়ে ছাত্র কর্মজীবনে প্রবেশ করতে চায় বা প্রবেশ করে। তখন দেখা যায়- যে সব দক্ষতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্জন করেছি তাতে কর্ম জীবন চলানো, নতুন করে ভিন্ন মনোভঙ্গী ও দক্ষতা অর্জন করতে হচ্ছে, বহুদিন লেগে যাচ্ছে শিক্ষানবিশিতে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা হয়ে পড়ছে বাস্তব চ্যালেঞ্জের ছোঁয়া বর্জিত- একেবারেই আপন কুত্তের একটি ভূবন।

পাঠ্য সূচির মধ্যেই যদি ব্যাপক ইন্টার্নশিপের ধারণা প্রচলিত থাকতো, আর পাঠ্যসূচির বাইরে খেজাসেবী অথবা সবেতন নানা রকম কাজ করার অভ্যাস যদি ছাত্রদের থাকতো, তা হলে এমনটি হতো না। আমাদের গ্রামীণ ব্যাংকের অভিজ্ঞতার কথাই বলি। অনেক দিন ধরে সারা দুনিয়ার নানা দেশ থেকে অনেক বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-ছাত্রী প্রতি বছর গ্রামীণ ব্যাংকে আমাদের সঙ্গে কাজ করতে আসে, গ্রামে গিয়ে সেখানে থেকে কাজ করে- জ্ঞান আর অভিজ্ঞতা সম্বয়ের জন্য। এরা কোন নির্দিষ্ট বিষয়ের ছাত্র নয়- বিভিন্ন তাদের পাঠ্য বিষয়। তবুও তারা আসে। আমাদেরকে রীতিমত একটি আলাদা বিভাগ খুলতে হয়েছে তাদের দেখানো করার জন্য। দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সে রকম আসতে দেখা যায়না। যে ক'জন আসে তাদের বেশীর ভাগ গ্রাইডেট বিশ্ববিদ্যালয়ের, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের নয়।

আমি বিশ্বাস করি তথ্য প্রযুক্তিকে যদি গরীব মানুষের কাছে নিয়ে আসতে পারি তবে তার নিজের উদ্যোগে নিজের দারিদ্র বিমোচনের কাজ অনেক সহজ হবে। তথ্য প্রযুক্তি বললেই সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনে ভেসে আসে কম্পিউটার, পিডিএ, মোবাইল, আইপড ইত্যাদি। আমেরিকা, ইউরোপের মানুষের কথা মাথায় রেখে এই গেজেটগুলি ডিজাইন করা হয়েছে। তাদের ক্রটি, এসব ব্যবহারে তাদের সহজবোধ্য, শৌখিন বোধ করা ইত্যাদি বিবেচনা করে এইগুলি ডিজাইন করা হয়েছে। আমরা যদি গরীব মানুষ, বিশেষ করে বাংলাদেশের একজন গরীব মহিলার কাছে তথ্যপ্রযুক্তি নিয়ে যেতে চাই সেটা কী ধরনের ডিজাইন করতে হবে? আমি এ প্রশ্নের আমার একটা জবাব দিয়ে দিই। আমি বলি যে এটার ডিজাইন আলাদািনের প্রদীপের মত করে করতে হবে। ব্যবহারকারী একজন গরীব মহিলাকে বুঝাতে হবে যে আপনি এটা ঘষলে এখান থেকে আলাদািনের ডিজিটাল সৈত্য বের হয়ে আসবে। সে এসে আপনাকে সালাম দেবে এবং জিজ্ঞেস করবে: “খালান্না, আমি আপনার জন্য কী করে দিতে পারি? আমি আপনার জন্য সকল খবর এনে দিতে পারি, দুনিয়ার সকলের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিতে পারি, আপনার সমস্যা সমাধানে সাহায্য করতে পারি। এবার বলুন আপনার কী সমস্যা?”

হোয়াই নট। এরকম চিন্তা করা যাবে না কে বলল। এর চাইতে আরো সাহসী ডিজাইন চিন্তা করা যায়। যদি একশ ডলারের কম মূল্যে গ্রামে ইন্টারনেট সুবিধাসহ ব্যবহারোপযোগী ল্যাপটপের কথা উদ্ভূত দেশের এক বিশ্ববিদ্যালয়ের কামরায় বসে চিন্তা না হতো, তাহলে আমরা ভেল কিংবা সনির ল্যাপটপের মধ্যেই থেকে যেতাম। এচিন্তা তো আমাদেরই করার কথা ছিল। এরকম কত কিছুই তো আমাদের করার কথা।

আমাদের সামনে এখন এসে গেছে সৃজনশীলতার যুগ। বুদ্ধির যুগ। টাকার চাইতে, খনিজ সম্পদের চাইতে, এযুগে সৃজনশীলতার কদর বেশি। যার মাধ্যম সমস্যা সমাধানের বুদ্ধি যত বেশী তার তত জরাজরকার। আগে মাধ্যম তথ্য ধারণের, ফরমুলা ধারণের কদর ছিল বেশি। মহাপণ্ডিতের মহা সম্মানের কারণ ছিল যে এক মাধ্যম ভেতর অনেক তথ্য তাঁরা ধরে রাখতে পারতেন। অন্যরা যারা তা পারতো না তারা তাঁদের পরামর্শে চলতো। এখন জ্ঞানের নানা দিকের পারস্পরিক সম্পর্কগুলি মাধ্যম রাখলেই চলছে। তথ্যগুলো মাধ্যম রাখতে হচ্ছে না।

ইন্টারনেটেই পাওয়া যায়। শুধু জানতে হবে কীভাবে এর নতুন ব্যবহার করা যায়, কীভাবে সৃজনশীলতা নিয়ে এগুলোকে খেলানো যায়, উদ্ভূত করা যায়।

আমাদের বিরাট সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে সৃজনশীলতার যুগে। সৃজনশীলতার আমাদের ঐতিহ্য আছে। আমাদের তরুণরা সৃজনশীলতার প্রমাণ রেখে যাচ্ছে। আমাদের জনসংখ্যার অর্ধেক বিশ বছরের কম বয়সী। আমাদের আছে বিরাট একটি তরুণগোষ্ঠী— একে তৈরি করে নেয়া সহজ। সেজন্য চাই উপযুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা। আমাদের বিরাট তরুণদের এমনভাবে গড়ে উঠার সুযোগ দিতে হবে যাতে তারা সারা দুনিয়ায় সৃজনশীল কাজে নেতৃত্ব দিতে পারে। আজ এটা সম্ভব। সৃষ্টিশীল কাজের কাঠামো দিতে পারলে সারা দুনিয়া থেকে সেটার জন্য বিনিয়োগকারীরা দৌড়ে আসবে। সেই বিনিয়োগ বাংলাদেশে হতে হবে এমনও কোন কথা নেই। বাংলাদেশী তরুণের বুদ্ধিতে আমেরিকায় কি জাপানে বিরাট ব্যবসা গড়ে উঠতে পারে। এটাই ইন্টেলেকচুয়াল প্রপারটির মজা। আমরা পৃথিবী জুড়ে বহু দামী দামী ইন্টেলেকচুয়াল প্রপারটির মালিক হতে চাই। একই সঙ্গে এই সৃজনশীলতা দিয়ে বাংলাদেশের দারিদ্রকে সবার আগে জাদুঘরে পাঠাতে চাই।

প্রায় ক্রমে শিক্ষার্থীদের যাত্রা শুরু হয় তত্ত্ব দিয়ে। তা-ও একটা সরলীকৃত তাত্ত্বিক কাঠামো দিয়ে। তত্ত্ব তৈরি হয়েছে বাস্তবকে বুঝতে পারার জন্য। বাস্তব আগে, তারপর তত্ত্ব। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো তত্ত্ব মজবুতভাবে পড়িত সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে উল্টা বাস্তবকে তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলতে হয়। তখন তত্ত্ব হয়ে যায় একটা ঝাঁচ। ব্যক্তিকে, সমাজকে, দুনিয়াকে এরমধ্যে ফিট করে নিতে হয়। স্বাভাবিক মানুষ, স্বাভাবিক সমাজ, স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড এর মধ্যে সহজভাবে ধরানো না গেলে একে দুমরিয়ে মুচরিয়ে ঢোকাতেও অনেকে পেছ পা হয় না। তখন তত্ত্ব হয়ে যায় সত্য। আর বাস্তব হয়ে যায় অনুকরণ।

আমি অর্থনীতির তত্ত্ব থেকে এরকম অনেকগুলি বিষয় তুলে ধরতে পারি। যেমন অর্থনীতিতে মহিলা পুরুষ বলে পৃথক কোন বিবেচনা নাই। যারা এই তত্ত্ব রচনা করেছেন তাঁরা পুরুষদের কথা মাথায় রেখে সব কথা বলেছেন। ফলে এখন মহিলাদেরকেও তত্ত্বের দেয়া খাপে নিজদের খাপ খাইয়ে নিতে হচ্ছে।



অর্থনীতিতে ব্যবসা বলতে একটা মাত্র কর্মকাণ্ডকেই বুঝানো হয়েছে—মুনাফা অর্জনের কর্মকাণ্ড। “উদ্যোক্তা” হচ্ছেন এমন এক ব্যক্তি যিনি সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের জন্য নিজের সমস্ত মেধা ও সৃজনশীলতা নিবেদন করেন। আমি বরাবর অনুভব করেছি এটা অর্থনৈতিক তত্ত্বের একটা বিরাট অসম্পূর্ণতা। সকল উদ্যোক্তাকে এই গণবাধা চরিত্রের মানুষ ধরে নিয়ে অর্থনীতি শাস্ত্র মানুষকে বুঝতে বিরাট ভুল করেছে। পুঁজিবাদী অর্থনীতি শাস্ত্র সেজন্য অর্ধসম্পূর্ণ শাস্ত্র হিসেবে থমকে আছে। শাস্ত্রের অসম্পূর্ণতার ফলাফল শুধু শাস্ত্রবিদদের আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে ক্ষতি ছিল না। এই অসম্পূর্ণতার মাসুল দিতে হচ্ছে পৃথিবীর সকল মানুষকে। উদ্যোক্তা হতে হলে সর্বোচ্চ মুনাফার দিকে ছুটতে হবে। সেটাই নিয়ম। সেটাই বিধান। কাজেই সবাই ছুটছে সর্বোচ্চ মুনাফার পেছনে। কারো দাঁড়াবার ফুরাসৎ নেই। মানুষের কী হলো, সমাজের কী হলো—সেটা বোঝার জন্য কারো চিন্তা করার দরকার নাই। বাজারের প্রতিযোগিতায় সবকিছু ঠিকঠাক হয়ে যাবে। কিন্তু ঠিকঠাক আর হয় না কিছুতেই। বাজার অর্থনীতির ধাক্কা খেয়ে যারা পথের ধারে পড়ে গেছে তাদের সেবাশুশ্রূষার দায়িত্ব রাষ্ট্রের কাছে দিতে হয়। বিশ্বায়নের গতি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি আরো মর্মান্তিক হয়ে যাচ্ছে। এবার শুধু কিছু মানুষ নয়, দুর্বল অর্থনীতিভলি সকল অর্থনীতির সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের একনিষ্ঠ সাধনায় সামগ্রিকভাবে পথে ধারে পড়ে যাবার উপক্রম হচ্ছে।

সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন ছাড়া কি অর্থনীতির জগতে মানুষের আর কিছু চাওয়ার নেই? আমার ধারণা মানুষ বিশাল মাপের একটি সৃষ্টি। সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনই তার ব্যবসায়িক জীবনের একমাত্র লক্ষ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। তার চরিত্রের আরো দিক আছে সেটা শাস্ত্রকাররা বিবেচনায় আনেননি। যেমন অন্য মানুষের মঙ্গল করা এটাও মানুষের চরিত্রের একটা মস্ত বড় দিক। অর্থনীতিতে সেদিকটা একবারে বাদ পড়ে গেছে। এটা ছেড়ে দেয়া হয়েছে দান-খয়রাত করার অর্থনীতি বহির্ভূত প্রবৃত্তি হিসেবে। মুনাফা অর্জন করবে। সম্পদ গড়বে। সঙ্গে সঙ্গে উন্নতির পরিচয় দিয়ে দান-খয়রাত করবে। দান খয়রাত অবশ্যই অপরের উপকার করে। কিন্তু তা অর্থনীতির সাথে জড়িত নয় বলে ব্যবসায়িক দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে না। মানুষের চরিত্রকে পূর্ণাঙ্গ বিবেচনায় আনতে হলে অর্থনীতির তাত্ত্বিক কঠামোতে ব্যবসার আরো

একটি দিক সংযোগ করতে হবে। সেটা হবে মানুষের মঙ্গলের জন্য ব্যবসা বা সোশ্যাল বিজনেস। এটা হবে এমন ব্যবসা যেখানে সফলতা বিচার হবে একটি ব্যবসা কতজন মানুষের কী ধরনের মঙ্গল আনতে পেরেছে তার উপর। কত বেশী মানুষের উপকার করতে পারে, তার উপর। কত উচ্চমাপের উপকার করতে পারে তার উপর। কত দ্রুত উপকার সাধন করতে পারে তার উপর। যেহেতু এটা ব্যবসা, তাকে টিকে থাকতে হলে এখানে এমন আয় করতে হবে যেন ব্যবসাকে লোকসান দিতে না-হয়। কিন্তু যদি ব্যবসায় লাভ হয় সে লাভ বিনিয়োগকারী পাবে না—সেটা কোম্পানীর কাছে থেকে যাবে তার সম্প্রসারণ বা উন্নয়নের জন্য। বিনিয়োগকারী তার বিনিয়োগের অর্থ ফেরৎ পাবে, শেয়ারের মালিক থেকে যাবে, কিন্তু এরপর কোনদিন কোন লভ্যাংশ পাবে না। লভ্যাংশের বদলে তাঁরা পাবেন অপরের মঙ্গল করার সম্বন্ধি—যার স্পৃহা মানুষের মধ্যে লভ্যাংশ অর্জনের স্পৃহার চেয়ে কম নয়।

অর্থনীতি শাস্ত্র যদি শুরুতেই সোশ্যাল বিজনেসকে তার কাঠামোর আওতায় নিয়ে আসতো তবে পৃথিবীতে এত অর্থনৈতিক বৈষম্যের, এবং সামাজিক ও পরিবেশগত সমস্যার সৃষ্টি হতে পারতো না। দারিদ্র্যও এতদিন টিকে থাকতে পারতো না। সামাজিক উদ্যোক্তারা বহু আগেই এমন প্রক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারতো যার ফলে দারিদ্র্য ও বৈষম্যের অবসান হতো, অথবা এটা দুশ্চিন্তায় পড়ার মত পর্যায়ে যেতো না।

সোশ্যাল বিজনেস একবার তাত্ত্বিক স্বীকৃতি পেলে মানুষ আরেকটি নতুন ধাপে নিজেকে ঢুকাবার সুযোগ পাবে যেটা সার্বিকভাবে কল্যাণকর হবে। একই মানুষ মুনাফা অর্জনের জন্য যেমন বিনিয়োগ করবে, মানুষের মঙ্গলের জন্যও বিনিয়োগ করবে। উভয় ক্ষেত্রে নিজের ব্যবসায়িক প্রতিভা ও দক্ষতাকে ব্যবহার করবে। ফলে সর্বোচ্চ মুনাফার কারণে যে অসংগতি সৃষ্টি হয় সোশ্যাল বিজনেসের মাধ্যমে দূর করা সম্ভব হবে। এই দুই ধরনের ব্যবসা আবার পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামার ফলে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনকারী ব্যবসা এককভাবে যেভাবে মুনাফা অর্জন করে যাচ্ছিল সেটা সম্ভব হবে না। এখন তারা জানবে যে মুনাফা নিয়ে বেশী বাড়াবাড়ি করলে সোশ্যাল বিজনেস ইন্টারপ্রেন্যুররা প্রতিযোগিতার সৃষ্টি করে তাদের বাড়াবাড়িকে নিয়ন্ত্রণ করার উদ্যোগ নেবে।

সোশ্যাল বিজনেস বা সামাজিক ব্যবসাকে পূর্ণ উদ্যমে বাজারে সক্রিয় হতে হলে তার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো লাগবে, যেমনঃ সোশ্যাল স্টক মার্কেট সৃষ্টি করা। প্রচলিত স্টক মার্কেটে শুধু সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনকারী ব্যবসায় বিনিয়োগ করা যায়। কাজেই পৃথক স্টক মার্কেট লাগবে যেখানে শুধু সোশ্যাল বিজনেসগুলি তালিকাভুক্ত থাকবে। বিনিয়োগকারী সোশ্যাল বিজনেসের শেয়ার কিনতে পারবে।

দারিদ্র নিরসন, মহিলাদের ক্ষমতায়ন, স্বাস্থ্যসেবা, ঔষধ উৎপাদন, পরিবেশ রক্ষা, নবায়নযোগ্য শক্তির প্রসার, পুষ্টি, স্যানিটেশন, ইত্যাদি বছরকম ক্ষেত্রে মানুষের মঙ্গলের জন্য সোশ্যাল বিজনেস সৃষ্টি করা যায়। যেখানে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা আছে সেখানেই তাকে লক্ষ্য করে সোশ্যাল বিজনেস সৃষ্টি করা যায়। আমাদের সৃজনশীল তরুণরা হাজার রকম সামাজিক ব্যবসার বৃদ্ধি করবে যেটা পৃথিবীর চেহারা পাশ্চাত্যে দিতে পারে। ইতিমধ্যে আমরা কয়েকটি সামাজিক ব্যবসার সৃষ্টি করেছি। যেমনঃ পুষ্টিহীন শিশুদের পুষ্টিহীনতা দূর করার জন্য সমস্ত পুষ্টি-উপাদান যোগ করে “শক্তি দই” উৎপাদন, চোখের ছানি দূর করে দুটি শক্তি ফিরিয়ে দেবার জন্য চকু হাসপাতাল স্থাপন, ইত্যাদি।

বিশ্ববিদ্যালয়ে করা আসবে, কি ভাবে আসবে এই বিষয়টিকেও সনাতন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নতুনতর দৃষ্টিভঙ্গিতে নিয়ে যাওয়া উচিত বলে মনে করি। অবশ্যই বর্তমানের মত মেধা এবং অগ্রহ এতে বড় ভূমিকা পালন করবে। কিন্তু শুধু সুনির্দিষ্ট বয়সের সুনির্দিষ্ট পটভূমির ছেলেমেয়ের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে সীমাবদ্ধ না রেখে অপেক্ষাকৃত অধিক বয়সের কর্ম-অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আসা তরুণ-তরুণীদেরকেও এতে আসার পথ করে দিতে হবে। তাদের ক্ষেত্রেও অগ্রহ এবং মেধা শর্ত হিসাবে কাজ করবে বটে, কিন্তু কর্মক্ষেত্রে অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতাও একটি উপাদান হিসেবে আসবে। তারা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাতে নতুন মাত্রা যোগ করে নানা ভাবে একে সমৃদ্ধ করতে পারবে। আশা করবো তাদের আসার সুবিধার্থে তাদের চাকুরীদাতা প্রতিষ্ঠানরাই বেতন বজায় রেখে ও বৃত্তি দিয়ে তাদেরকে সুযোগ করে দেবে। এর মাধ্যমে জীবন ও কর্মের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগটি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার মধ্যে যেমনটি ঘটবে, তেমনি যারা নানা কারণে প্রথম বয়সে বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা আসেনি বা আসতে পারেনি, তাদের জন্যও সুযোগ সৃষ্টি হবে।

দরিদ্রতমদের জন্য উচ্চ শিক্ষা- এই পুরো বিষয়টি আলাদা করে গুরুত্ব পাওয়া উচিত। সামাজিক ও অর্থনৈতিক সকল স্তর থেকে মেধাবী ও সৃষ্টিশীলদেরকে যদি আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে না আনতে পারি তা হলে শিক্ষার্থী স্বকীয়তার সম্পূর্ণ বৈচিত্র্যকে ধারণ করে জাতি তার পুরো সম্ভাবনাকে বিকশিত করতে ব্যর্থ হবে। যে সব বাধা গরীব ঘরের তরুণ তরুণীদেরকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত আসতে বাধ সাধে তার যথাসাধ্য প্রতিকার করে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাকে তার কাছে সমানভাবে লভ্য করতে হবে বিশেষ বৃত্তি, শিক্ষা স্বণ, ইত্যাদির মাধ্যমে। এতে একদিকে ব্যাপকভাবে মানব সম্পদের যেমন বিকাশ ঘটবে, অন্য দিকে এক প্রজন্মের মধ্যে দরিদ্র পরিবারের দারিদ্র নিরসনেরও একটি সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা হবে।

আমরা সৌভাগ্যবান যে আমরা এখন নলেজ সোসাইটিতে বাস করছি। আগের দিনগুলোতে আমরা হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিতাম। আজকের প্রযুক্তি আমাদের সেই আক্ষেপ দূর করে দিয়েছে। এ প্রযুক্তি বলছে তোমার যদি জ্ঞান থাকে সেটিই যথেষ্ট, নলেজ সোসাইটির জন্য সেটিই বড় পুঁজি। আর আমাদের এই বড় পুঁজির খনি হলো এই বিশ্ববিদ্যালয়। তা হলে এই পুঁজির অধিকারী হয়ে আমরা দুনিয়ার যে কোন কারো সমকক্ষতা লাভ করতে পারি, আমরা যে পিছিয়ে আছি এই কথা চিরতরে মুছে ফেলতে পারি। সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্যেও শিক্ষার যে সামান্য পুঁজি আমরা সৃষ্টি করতে পেরেছি, সারা দুনিয়ায় সেটুকুই কেমন কাজ করছে তা একবার দেখুন। এই টুকুতেই আজ বাংলাদেশী ছেলে মেয়েরা দেশে দেশে অসামান্য কৃতিত্ব দেখাচ্ছে, প্রচুর সম্পদও সৃষ্টি করছে নিজের জন্য, দেশের জন্য এবং বিশ্বের জন্য। আর যদি শিক্ষাকে, বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাকে আরো সার্থক করতে পারি তা হলে তারা আরো কি করতে পারে এটা ভাবতেই সম্ভাবনার আনন্দে মনে শিহরণ জাগে। আমরা মানব সম্পদের দারুণ মূল্যবান বনির উপর বসে রয়েছি। এই সম্পদ কি বের করে আনব না? প্রত্যেকটি ছাত্রকে তার স্বকীয়তাকে আবিষ্কার করতে দিয়ে, সমস্যাকে তার নিজের চোখে দেখার সুযোগ দিয়ে এটি আমরা করতে পারি।

বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের জাতীয় জীবনের মুক্ত চিন্তার ও কর্মযজ্ঞের ক্যাটাগরি হিসাবে কাজ করবে। স্বকীয় চিন্তা ও কর্মের সঙ্গে এর নাকড়ির যোগ প্রথম থেকেই থাকতে হবে। আমরা বাধাধরা কথার জাতি হতে



চাইনা, কর্মের জাতি হতে চাই। নিজকে কর্মযজ্ঞের সঙ্গে সংযুক্ত না করে আমরা শুধু তত্ত্ব আঁকড়ে ধরতে চাইনা, বিশ্ববিদ্যালয়েও নয়। বলা হয়ে থাকে, যে পৃথিবী ভ্রমণ করতে বের হয় তাকেও বাড়ীর সামনে প্রথম পদক্ষেপটি নিতে হয়। আমরা আমাদের কোন পদক্ষেপকে খাটো করে দেখতে চাইনা। যদি তা দেখি তা হলে কোনদিনই আমাদের পৃথিবী ভ্রমণ করা হবেনা। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়কে গড়ে তুলতে পারি স্বকীয় চিন্তা ও কর্ম-যোগ সৃষ্টির কারখানা হিসেবে। এখানেই সবাইকে অভ্যস্ত করতে পারি সেই প্রথম পদক্ষেপগুলো নিতে যা আমাদেরকে নিয়ে যাবে বিশ্ব জয়ে। আমরা হতে চাই বিশ্বজয়ী বাঙ্গালী। আমাদের তরুণরা একদিন আমাদেরকে সেখানে নিয়ে যাবে আমার এই দৃঢ় বিশ্বাস আছে।

~~আজ আপনারা যারা বিভিন্ন শাস্ত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী গ্রহণ করলেন তাদেরকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। আপনাদের সার্থক জীবন কামনা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।~~

উপস্থিত সকলকে আমার ধন্যবাদ জানাচ্ছি।